চেতনায় বঙ্গবন্ধু
চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু

চেতনায় বঙ্গবন্ধু
চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু

ড. সুমন কুমার পান্ডে সম্পাদিত

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
চৈত্র ১৪২৭ মার্চ ২০২১

প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
৪০/১, মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১৩৬২
মোবাইল : ০১৯৭১৬৬৪৯৭০

বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : সম্পাদক

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ২০০.০০ টাকা

Cetonai Bangobondhu Cironjib Bangobondhu
Edited by **Dr. Sumon Kumar Pande**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com
First Published : March 2021

Price : 200.00
US $ 10

ISBN 978 984 95672 6 4

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http ://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https ://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http ://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http ://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭

http ://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http ://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
যাঁর জন্ম না হলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির জন্ম হতো না।

ভূমিকা

বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি সমার্থকবোধক শব্দ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি এবং বাঙালি জাতির পিতা। বাংলাদেশের ইতিহাস যেমন বঙ্গবন্ধুকে ছাড়া অসম্পূর্ণ, তেমনি বঙ্গবন্ধুর ইতিহাসও।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান। তিনি একমাত্র বাংলাদেশের ইতিহাসেই নয়, উপমহাদেশের ইতিহাসেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক।

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান। মাতা সায়েরা খাতুন। শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলের ছাত্র অবস্থায় কারাবরণ করেন। ১৯৪২ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে তিনি কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হয়ে তিনি বেকার হোস্টলে থাকতেন। তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের নির্বাচনি প্রচারে তিনি ফরিদপুর জেলার দায়িত্বপালন করেন। তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক ও দাঙ্গাবিরোধী। ১৯৪৭ সালে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বৃহত্তর স্বাধীন বাংলা দাবি করেন। শেখ মুজিব স্বাধীন বাংলার সমর্থক ছিলেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হলে ভারত-পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা শুরু হয়। গান্ধী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে শান্তিস্থাপনের জন্য কলকাতায় অবস্থান নেন। এ সময় গান্ধী ও সোহরাওয়ার্দীর সাথে শেখ মুজিব শান্তি প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে বিএ পাশ করে ঢাকায় চলে আসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৮ সালের চৌঠা জানুয়ারি ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা ও ১১ই মার্চ ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তিনি ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারীদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় হতে বহিষ্কার করা হয়।

তিনি মুচলেকা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আর ফিরে আসেননি। তিনি বারো

বছর কারাজীবন ভোগ করেন। ১৯৪৯ সালে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি করে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। ১৯৫২ সালে জেলে আটক থাকা অবস্থায় তিনি বাংলা ভাষা আন্দোলন সমর্থন জানান। ১৯৫৪ সালে মাত্র ৩৪ বছর বয়সে তিনি প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। তিনি পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৫৩ সালে তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি হলে তাঁকে সামরিক আইনে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬০ সালের ৫ই ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি বাঙালি জাতির বাঁচার দাবি ছয় দফা পেশ করেন। ১৯৫২ সালে ভাষার দাবিতে যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে তা পূর্ণতা পায় ছয় দফা দাবি ঘোষণায়। ১৯৬৮ সালে তাঁকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি করা হয়। আগরতলা মামলার ৩৫ জন আসামির বিরুদ্ধে বিচার শুরু হয়। ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে গণ অভ্যুত্থান হয়। সরকার বাধ্য হয়ে আগরতলার মামলা তুলে নেয় এবং ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি তাকে মুক্তি দেয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারি জনতা তাঁকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করে। তিনি মুক্ত মানুষ হিসেবে লাহোর গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। শেখ মুজিব ছয় দফা পেশ করেন। আইয়ুব খান ছয় দফা গ্রহণ না-করায় বৈঠক ভেঙে যায়। আন্দোলন চলতে থাকে। অবশেষে আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ২৪শে মার্চ পদত্যাগ করেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হলেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন দখল করে। ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে তিনি মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। ৭ই মার্চ স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রস্তুতির ডাক দেন। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং গণহত্যা শুরু করে। বঙ্গবন্ধু ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা দেন। শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী হলেন তাজউদ্দীন আহমদ। ভারত মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করে এবং এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী মিত্রবাহিনী গঠন করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকবাহিনী ঢাকায় আত্মসমর্পন করে। পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে।

বঙ্গবন্ধু গান্ধীর ন্যায় একাধিকবার কারাবরণ করেন। বঙ্গবন্ধু গান্ধীর অহিংসনীতি ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সংগ্রামী চেতনায় প্রভাবিত ছিলেন। সুভাষচন্দ্র বসু সশস্ত্র যুদ্ধ করে ভারতকে স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সংগ্রামে জয়ী হতে পারেননি। বঙ্গবন্ধু সশস্ত্র যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করেন। উপমহাদেশের দুই সংগ্রামী নেতার সংমিশ্রণ বঙ্গবন্ধুর মধ্যে ঘটেছিল। নিউজউইক তাঁকে 'Poet of Politices' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির জনক ও স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে ৩০ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেন। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠান করেন। ভারত বিভাগকালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লক্ষ লক্ষ হিন্দু-মুসলমান নিহত হয়েছে। প্রায় দেড় কোটি লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছে। বিশ্বের ইতিহাসে এত বড় বাস্তুত্যাগ ও হত্যাকাণ্ড ঘটেনি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে— জিন্নাহর এ যুক্তি বাস্তবে মিথ্যা প্রমাণিত হলো। আজও উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমান নির্যাতিত হচ্ছে। অসংখ্যবার দাঙ্গা হয়েছে। কয়েকবার পাক-ভারত যুদ্ধ হয়েছে।

মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলন করে ইংরেজদের ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। তিনি যুদ্ধ না করে অহিংস আন্দোলন করে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করেন। ভারতবাসী ভালোবেসে তাঁকে 'মহাত্মা' উপাধি দেন। তিনি বিশ্বের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তাঁর অহিংসনীতি বিশ্বের শান্তির পথ দেখাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালি জাতি নয় মাস যুদ্ধ করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছে। দুই মাথাবিশিষ্ট পাকিস্তান ২৩ বছরের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান নামের রাষ্ট্র পৃথক হয়ে ভাষাভিত্তিক বাংলাদেশ সৃষ্টি হলো। বাঙালি জাতির ভাষা সংস্কৃতি ভিন্ন। বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বের নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের মুক্তিদূত হিসেবে চিরদিন বেঁচে থাকবেন।

স্বাধীন ভারতের জনক মহাত্মা গান্ধী, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং স্বাধীন বাংলার প্রতিষ্ঠাতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে একই সারিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। তারা স্ব স্ব জাতিকে একটি দেশ একটি পতাকা দিয়েছেন। হাজার হাজার বছর ধরে তারা পৃথিবীর ইতিহাসে রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ছিল বড় আনন্দের। যদিও জীবনের অনেকটা সময় তাঁর কেটেছে কারাগারে এবং রাজনৈতিক কর্মব্যস্ততায়। পরিবারের সবার সঙ্গে থেকেও যেন থাকা হতো না। তাঁর বাবা-মার আদরযত্ন, ভাইবোনের ভালোবাসা, স্ত্রীর প্রেম ও মমত্ব, সন্তানদের শ্রদ্ধা এবং আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের নিবিড় সম্পর্ক একদিকে তাঁর ব্যক্তিজীবনকে পরিপুষ্ট করেছে, ভরপুর করেছে উদারতায়; আবার ইস্পাতসম কাঠিন্যে শক্তি জুগিয়েছে, লক্ষ্যে পৌঁছাতে আদর্শবাদী ও আত্মত্যাগী করে তুলেছে। একসঙ্গে তাঁর দেশপ্রেম ও দেশের মানুষের জন্য ভালোবাসা যেন তাঁর প্রাণশক্তি ছিল। পারিবারিক জীবনের সুখ ও আনন্দ ফেলে এসে জনগণের জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। শুধু সমাজ, দেশ ও জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেছেন দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য। নিজের জীবনের জন্য কখনো ভাবেননি। নিজের মা-বাবার দিকে ফিরে তাকাননি। বৃদ্ধ মা-বাবারও কোনো খোঁজখবর রাখার সময় পাননি। অথচ তাঁর জন্য তাঁর বাবা-মা, স্ত্রী-সন্তানদের ওপরেও আঘাত এসেছে; তাঁদেরও নানারকম যাতনা ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে।

১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ টুঙ্গিপাড়া নামে এক প্রত্যন্ত গ্রামে শেখ মুজিবের জন্ম হয়। তাঁর জন্মগ্রহণ পুরো 'শেখ' বংশে আনন্দ বয়ে এনেছিল। দুই মেয়ের পর ছেলে জন্ম নেওয়ায় মা সায়েরা খাতুন খুব খুশি হয়েছিলেন। তাঁর পিতা নাতির নামকরণ করে গর্বিত মাকে সেদিন বলেছিলেন, 'মা সায়েরা, তোমার ছেলের জগৎজোড়া নাম হবে।' বৃদ্ধা মা বাংলাদেশের স্রষ্টা হিসেবে তাঁর ছেলেকে দেখে এ কথা স্মরণ করতেন এবং সেই গর্ব নিয়েই জীবন অতিবাহিত করেন।

বঙ্গবন্ধুর শৈশব-কৈশোর মা-বাবার আদর্শ-শাসনে এবং যত্নে কেটেছিল। মায়ের চিন্তা ছিল তার রোগাপাতলা ছেলে 'খোকা' কবে বড় হবে? টুঙ্গিপাড়ায় গ্রামের বাড়িতে তাঁর শৈশব কেটেছিল। গ্রামীণ জীবনের রূপ-রস-গন্ধ তাঁকে সরল-সাধারণ ও কোমল করে গড়ে তোলে, তেমনি

গ্রামের মানুষের সংগ্রাম তাঁকে অভিজ্ঞ করে তোলে।

বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশের জন্য বঙ্গবন্ধুর পরিবার জীবন দিয়ে যে বিরাট আত্মদান করে গেছেন তা সংগ্রাম, সাহস, শক্তি, মানবিকতা ও কল্যাণের আদর্শে মহীয়ান করে রাখতে পারি, আজ এটাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

যে মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সে মাটির সঙ্গে নিঃশর্ত একাত্মতাবোধ করেছিলেন, প্রবলভাবে ভালোবেসেছেন সে মাটির সন্তানদের। বাংলাদেশের নদী-মাঠ খেত ফুলফল আলো বায়ু যেমন প্রাণ জুড়িয়েছিল তাঁর, তেমনি সে প্রাণে ঠাঁই করে নিয়েছিল চঞ্চল কিশোর, শ্যামল রমণী, স্বেদাক্ত যুবক, মহাকালের সাক্ষী বৃদ্ধ। স্বদেশ ও মানুষের প্রতি এ নিখাদ ভালোবাসাই তাঁর জীবনের মূলকথা, তাঁর শক্তির উৎস।

এই ভালোবাসা থেকে দেশ ও জাতির প্রতি নিজ কর্তব্য করে গেছেন তিনি অন্তত তিরিশ বছর ধরে। কখনো জনতার মধ্য দিয়েই পথ করে নিয়ে তিনি গেছেন বক্তৃতার মঞ্চে, ক্ষমতার আসনে, কারাগারের অন্তরালে। কখনো তিনি থেকেছেন অগণিত মানুষের মিছিলের পুরোভাগে প্রতিবাদে, ক্ষোভে, প্রত্যাশায়, দাবিতে। কখনো পেয়েছেন রাষ্ট্রপরিচালনার ভার— সাফল্যে উল্লসিত, ব্যর্থতায় বেদনাহত, গৌরবের উদ্ভাসে দীপ্ত, সমালোচনার বাণে বিদ্ধ, কোলাহল থেকে অকস্মাৎ অন্তর্হিত হয়েছেন নির্জন কারাপ্রকোষ্ঠের নিভৃতে, বাইরের জগতের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে থেকেছেন মৃত্যুর অপেক্ষায়।

তাঁর অদম্য সাহস ও অকুণ্ঠ আত্মত্যাগ, সাংগঠনিক শক্তি ও নেতৃত্বদানের ক্ষমতা, মানুষের আপনজন হওয়ার ও তাদের বিশ্বাস অর্জনের পারগতা— এসবই তাঁকে ধীরে ধীরে রূপান্তরিত করেছিল রাজনৈতিক কর্মী থেকে জননায়কে।

নিজের বাঙালিসত্তার গভীর অনুরণন উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। কখনো স্বভাবের প্রেরণায়, কখনো সযত্ন উৎসাহে তার উন্মোচন ঘটিয়েছিলেন। দেশবাসীকেও তেমনি অনুপ্রাণিত করেছিলেন সেই সত্তার জাগরণ ঘটাতে। দেশ ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা থেকে এক মোহনীয় স্বপ্ন রচনা করেছিলেন তিনি ধীরে ধীরে, সেই স্বপ্ন সফল করার আহ্বান জানিয়েছিলেন সকলের প্রতি। কী বিপুল সাড়া তিনি পেয়েছিলেন, তাঁর পরিচয় তো আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। ১৯৬৯-এ, ১৯৭০-এ, ১৯৭১-এ, কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা— দুর্বার স্রোতে এলো কোথা হতে সমুদ্রে হলো হারা, সে কথা লেখা থাকবে ইতিহাসের পাতায়।

দেশের প্রথিতযশা লেখক সাংবাদিকের সমাদৃত লেখা নিয়ে এই বই গ্রন্থনা করা হয়েছে। হৃদয়ছোঁয়া গল্প যেমন আছে তেমনি বিশ্লেষণধর্মী নিবন্ধও যুক্ত করা হয়েছে। আশাকরি আমাদের নতুন প্রজন্মের পাঠকরা বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সত্যানুসন্ধানে আরও বেশি নিবিষ্ট হবে।

কথাসাহিত্যিক অস্ট্রিক আর্যু বইটির গ্রন্থনা ও মুদ্রণে সহৃদয় সহযোগিতা করেছেন, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা। এছাড়া প্রকাশক মোঃ আফজাল হোসেন ও প্রকাশনায় সংশ্লিষ্ট সকলকের প্রতি ধন্যবাদ। বইটি পাঠকের নিকট সমাদৃত হলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

ড. সুমন কুমার পান্ডে
মার্চ ২০২১

সূচিপত্র

অবিস্মরণীয় শোকের দিন/ কবীর চৌধুরী ১৫
বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধু হয়েও তিনি বাঙালি পরিচয় ছাড়তে চাননি/ আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী ১৮
জীবনে-মরণে সুখ-দুঃখের সাথি/ শেখ হাসিনা ২২
বঙ্গবন্ধুর পারিবারিক জীবন/ বেবী মওদুদ ২৫
কারো লক্ষ্য স্বাধীনতা কারো লক্ষ্য মুক্তি/ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ২৯
নৃশংস হামলার ৪০ বছর/ সৈয়দ শামসুল হক ৩৬
স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু সমার্থক/ তোফায়েল আহমেদ ৩৮
প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বঙ্গবন্ধু/ ওবায়দুল কাদের ৪১
এর চেয়ে নৃশংস কিছু হয় না/ হাসান আজিজুল হক ৪৫
সময়ের ঊর্ধ্বে এক জীবন/ শামসুজ্জামান খান ৪৮
বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ/ মুনতাসীর মামুন ৫২
মুজিবের মৃত্যু কি সহজ কথা/ সেলিনা হোসেন ৫৬
বঙ্গবন্ধুকে কেন হত্যা করা হলো/ শাহরিয়ার কবির ৬০
বঙ্গবন্ধু ও একটি ঐতিহাসিক আমগাছ/ বিপ্রদাশ বড়ুয়া ৬৫
৭ই মার্চ ॥ ঐতিহাসিক ভাষণ-দিবস/ নির্মলেন্দু গুণ ৬৭
সংগ্রাম ও স্বাধীনতার অপর নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান/ অধ্যাপক ড. আ. আমস আরফিন সিদ্দিক ৭০
যখন জমবে ধুলা তানপুরাটার তারগুলায়/ হুমায়ূন আহমেদ ৭৩
ফিরে ফিরে দেখা/ মুহম্মদ জাফর ইকবাল ৭৫

অবিস্মরণীয় শোকের দিন

কবীর চৌধুরী

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট। ওই দিনটি হওয়ার কথা ছিল আনন্দের, খুশির উৎসবের। জাতির জনক হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি আনন্দঘন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। রাতে কিছু এলোমেলো গুলির শব্দ শোনা গেল। কয়েকটি সাঁজোয়া গাড়ি চলাচলের শব্দও পাওয়া গেল। সবাই ভাবল, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অনুষ্ঠান হবে এবং তারই মহড়ার অংশ। সত্যি সত্যি কী ঘটছে নৃশংস ঘাতকদের দল ছাড়া কেউ সে সম্পূর্ণ কোনো ধারণা করতে পারেনি। এবং তারপর বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তাবিধানের দায়িত্বে যারা নিয়োজিত ছিল তারা কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাংলার মিরজাফর খন্দকার মোশতাকের নির্দেশে ঘাতকরা বন্ধবন্ধুর ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়িতে হানা দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের বহু সদস্যকে হত্যা করে।

মোশতাক বাহিনীর কালো পোশাক পরা হিংস্র ঘাতকরা সকালের আলো ফোটার একটু আগেই বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য তার ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বর ভবনে ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করার লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওদের গুলির শব্দ শুনে শেখ কামাল ওপর থেকে নিচে নেমে আসে। ঘাতকরা তাকে সরাসরি ব্রাশফায়ারে হত্যা করে। তারপর তারা সিঁড়ির ওপরে হত্যা করে স্বাধীন বাংলাদেশের জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। কেন তাঁকে হত্যা করা হলো? কারা তাঁকে হত্যা করল? তাঁর মৃত্যুতে কারা লাভবান হলো? এসব প্রশ্নের উত্তর এখন আর কুয়াশাবৃত নয়। বঙ্গবন্ধুকে তারাই হত্যা করে, যারা তাঁর আকাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ

চায়নি। বঙ্গবন্ধু শুধু একটি স্বাধীন দেশ চাননি, তিনি চেয়েছিলেন তার স্বাধীন দেশ কয়েকটি সুস্পষ্ট নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করবে। সেজন্যই তার অনুপ্রেরণায় প্রণীত ১৯৭১ সালের শাসনতন্ত্রে দেশপরিচালনার মূল চার নীতি হিসেবে স্থান পায় গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বঙ্গবন্ধুর বিরোধীরা এটা মেনে নিতে পারেনি। তারাও হয়তো বাংলাদেশের স্বাধীনতা চেয়েছিল কিন্তু তাদের কাম্য ছিল পাকিস্তানের মতো একটি দেশ— যেখানে ইসলাম রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা পাবে, ধর্মনিরপেক্ষতা একটি পরিত্যাজ্য বিষয় বলে গণ্য হবে, আর সমাজতন্ত্র হবে একটা অনুচ্চার্য বিষয়। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে তাদের এসব অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হবে না। তাই ঘাতকের দল বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়।

বঙ্গবন্ধু-হত্যা প্রসঙ্গে অনুদাশঙ্কর রায় লিখেছেন :

> নরহত্যা মহাপাপ, তার চেয়ে পাপ আরও বড়
> করে যদি যারা তার পুত্রসম বিশ্বাসভাজন জাতির
> জনক যিনি অতর্কিত তারেই নিধন।
> নিধন সবংশে হলে সেই পাপ আরও গুরুতর।
> সারাদেশ ভাগী হয় সে ঘোর পাপের।

বঙ্গবন্ধু হত্যার পর বাংলাদেশের শনিগ্রহ জেনারেল জিয়া এই দেশকে আবার পাকিস্তানি ধারায় নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেন। তিনি 'জয় বাংলা' ধ্বনি বর্জন করে পাকিস্তানি কায়দায় 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' চালু করলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তিকে সম্মানের আসনে পুনর্বাসিত করলেন। পাঠক, শাহ আজিজুর রহমান ও আবদুল আলীম প্রমুখের কথা স্মরণ করতে পারেন। এর চেয়েও ভয়াবহ ও নৃশংস কিছু কাজ জেনারেল জিয়া সম্পাদন করেন। প্রহসনমূলক সামরিক বিচারের মাধ্যমে তিনি শত শত মুক্তিযোদ্ধাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে কিংবা ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিয়ে হত্যা করেন। ওই সময় দেশের বিভিন্ন ক্যানটনমেন্টে যে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ পরিচালিত হয় তা আমাদেরকে নাৎসি নেতা এডলফ হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু হিটলার ছিলেন একজন অসুস্থ, প্রায় উন্মাদ ব্যক্তি আর জিয়াউর রহমান তার নিধনযজ্ঞ পরিচালনা করেন ঠান্ডা

মাথায়। এক সংকট মুহূর্তে তার প্রাণ রক্ষাকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল তাহেরকে তিনি দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য সামরিক ট্রাইবুনালে বিচার করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন ও তা দ্রুত কার্যকর করেন। এর মধ্য দিয়ে জেনারেল জিয়ার উচ্চাভিলাষ, ক্ষমতা দখলের লোভ, চতুর ও নৃশংস ষড়যন্ত্রকারীর চরিত্র খুব স্পষ্টভাবে সবার চোখে ধরা পড়ে।